ICBM
International Centre for Bengali Music
আন্তর্জাতিক বাংলা সঙ্গীত কেন্দ্র

বাংলাগানের রূপবৈচিত্র্য

ড. নূপুর গাঙ্গুলী
ড. নূপুর গাঙ্গুলী: সহযোগী অধ্যাপিকা, কণ্ঠসংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৫০

সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাংলাগান অবর্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাগানের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণে দেখা যায় বহু মতভেদ, কিন্তু বহু শাখায় পল্লবিত বাংলাগানের রূপবৈচিত্র্য দেখে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে এর পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বহু গুণীজনের হাত ধরে বাংলাগানে এসেছে শৈলীবৈচিত্র্য, সুরবৈচিত্র্য। বর্তমান প্রবন্ধে সেই নিয়ে এবং বাংলাগানের শ্রেষ্ঠ সময় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

Bengali songs have reached the present state after going through a long period of time. There are diverse opinions as to the specific definition of Bengali song, but one has to marvel at the diverse forms of Bengali songs flourishing in many directions and their evolution decades after decades. Manyu illustrious persons have contributed to the variety of Bengali songs with respect to its style and tune. The present essay will dwell on that and the best period of Bengali song.

বাংলাগানের কিন্তু সর্বমান্য কোন সংজ্ঞা নেই। শুধু যদি বাংলাভাষায় রচিত গানকে বাংলাগান বলা হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবে বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষার বিভিন্নরূপ, কোন অঞ্চলের ভাষাটি গ্রহণ করা হবে? নাকি শুধু শহরের ভাষায় রচিত কাব্যগীতিকে বাংলাগান বলা হবে? তাই যদি হয় তাহলে লোকগীত বা ধর্মীয় গান কোন পর্যায়ভুক্ত? আবার যদি রাজধানীতে প্রচলিত বাংলাভাষার কথা বলি তাহলে প্রশ্ন উঠবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় রাজধানী ছিলো যেমন– গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ, ইংরেজ আমলে কোলকাতা; কোথাকার ভাষাকে গ্রহণ করবো? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত তালিকাটি অবলোকন করলে অর্থাৎ বাংলাগান বলতে কোন গালগুলিকে বোঝায় তা পরিষ্কার হবে।

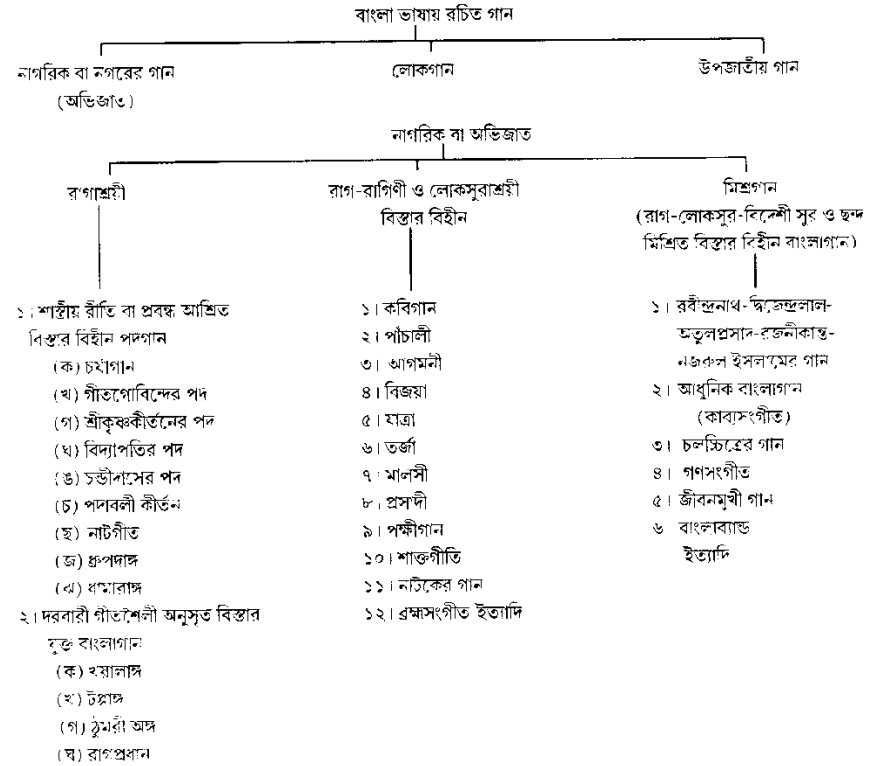

বাংলা গানের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে প্রথমেই পাই চর্যাগানকে। পদ্ধতিমূলক সাধনসংগীত যার ভাষাও পরিষ্কার বাংলাভাষা নয় এবং জনসাধারণের গানও নয়। সুরের আরোহণ-অবরোহণ ও রাগরাগিণীর মিশ্রণে বিপ্রকীর্ণ' শ্রেণীর পদগান। তারপরে পাই বাংলাঘেঁষা সংস্কৃতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' (১২শ শতক)। জয়দেবের সুললিত পদে রচিত কাব্যগ্রন্থটিকে বাংলাগানের জাগরণের প্রথম শঙ্খধ্বনি বলা যায় বা বঙ্গসংস্কৃতিকে একাধারে সাহিত্যধারা এবং গীততরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে বারটি রাগ ও পাঁচটি তালের ভিত্তিতে যে অনুপম সৃষ্টি করেছেন জয়দেব, পরবর্তীকালে সকল বৈষ্ণব কবি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার অনুসরণ চলেছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-অভিমান বিষয় নিয়ে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি পদরচনা করলেন, সময়টা আনুমানিক চতুর্দশ শতক। গবেষণার দ্বারা জানা গেছে বিদ্যাপতি তৎকালীন মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করেছেন। কালক্রমে সেই পদ বঙ্গভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাঙালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বলে গ্রহণ করে। এমনকি চৈতন্যদেবও মুগ্ধ হতেন তাঁর রচিত পদে।

এরপর আমরা পাই পদাবলীর চণ্ডীদাসকে (আ. ষোড়শ শতক) যিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি। বাংলাগানের ইতিহাস গীতিকার ও সুরকার হিসাবে চণ্ডীদাসকে অমর করে রেখেছে। সহজ সরলভাবে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় তাঁর পদ রচিত, প্রত্যেক পদের উপর রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে। প্রথম আমরা পাই মানুষের কথা– 'শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই'। এই চণ্ডীদাসের আগে আমরা আরেক কবি চণ্ডীদাসকে পাই। কায়াশাঘেরা বাংলায় রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের রচয়িতা। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলে মানা হয়। রাগ ও তালে নিবদ্ধ সকল কবিতাগুলিই গান। রাধাকৃষ্ণ প্রেম বর্ণিত হয়েছে, পণ্ডিতদের মতে কিছুটা অশ্লীল ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট।

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।" দিনেশচন্দ্র সেন যাঁর সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব (১৪৮৬–১৫৩৩ খ্রি.)। চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাঁর পূর্বে রচিত পদাবলীর ওপরে নতুন আলোকসম্পাত ঘটল। পদাবলীর মাধুর্য্য, ভাষায় লালিত্য ও ছন্দে বিভোর হলেন তিনি। বাংলার ঐতিহাসিক দুঃসময় ভেদ করে জ্ঞান ও দিব্যসংস্কৃতির আলোকবর্তিকা তিনি হাতে তুলে নিলেন। প্রথম গণ-সংগঠক, কবি চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই সত্যটি পালন করে দেখালেন কেমন করে হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করে প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে হয় মানুষকে। গীতগোবিন্দের পদ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী মূর্ত হয়ে উঠল বাঙালীর কীর্তন বাসরে। এরপর জন্ম হয় 'কীর্তন' শৈলীর। আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রিঃ চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা নরোত্তম দাস ঠাকুরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত 'খেতুরী মহোৎসব'। সৃষ্টি হয় 'গৌরচন্দ্রিকা' সহযোগে প্রবন্ধের কঠিন নিয়মে আবদ্ধ 'গরাণহাটি' কীর্তন। এই কীর্তন খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। নিয়ম শিথিল হয়ে আঞ্চলিক গেয়ভঙ্গি সহযোগে পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয় রেনেটী, মনোহরশাহী ও ঝাড়খণ্ডী কীর্তন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আমরা পাই আখর বিহীন ও আখরযুক্ত কীর্তন যা রস বা লীলাকীর্তন নামে প্রচলিত হয়। কীর্তনে যখন আখর প্রয়োগ শুরু হলো তখন কীর্তন হয়ে উঠলো 'শৈলীর' গান। যেসব কীর্তনে আখর অর্থাৎ পদবিস্তার নেই সেগুলিকে পদগান বা প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত বলা হবে।

এই পর্যন্ত আমরা যে ধরনের গান পেলাম এগুলি সবই পদগান বা প্রবন্ধগীত। এগুলি রীতির গান অর্থাৎ গাইবার সময় বিস্তারক্রিয়া ছিল না। বাংলাতে এই ঐতিহ্য ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উল্লিখিত গানগুলি ছাড়াও ধর্মীয় আবেদনের উপর ভিত্তি করে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক আরো এক ধরনের গান অষ্টাদশ শতকের পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক এবং মহাকাব্যিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত ছিল মঙ্গলকাব্য– মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবমঙ্গল, রামায়ণী গান। চৈতন্যোত্তর কালে প্রশ্নোত্তরমূলক গান তর্জা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জক আদি রসাত্মক গান। পালা-পার্বণ উপলক্ষে জমিদার বাড়ীতে বসত তর্জা বা কবির লড়াই, পালা গান কখনও বা ঝুমুরগানের আসর।

এই সময় বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্ত পদাবলীরও একটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি শ্যামা বিষয়ক অপরটি উমা বিষয়ক আগমনী ও বিজয়া গান। শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন (আ. ১৭১৮ -১৭৭৫ খ্রি.) এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরসুরী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেল, ব্রিটিশ শাসন কায়েম হল ভারত তথা বাংলার বুকে। কলকাতা, বাংলার রাজধানী হওয়ায় গ্রামের লোকসংগীত শিল্পীরা অন্নসংস্থানের জন্য শহরমুখী হলো; ফলে পদগানের সঙ্গে লোকসুর ও গ্রাম্যগীতগুলি মিশে সৃষ্টি হলো 'বাবুসমাজের গান'। কবিগান, পাঁচালীগান, ঢপ কীর্তন, আগমনী, বিজয়া ইত্যাদি গ্রাম্য গানগুলি লোকসুর, প্রবন্ধগান ও রাগ রাগিণী মিশ্রিত হয়ে এক নতুন ধাঁচের গান সৃষ্টি করল যাকে বলা হতো বাবুসমাজের গান।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের শোরী মিঞার টপ্পার অনসরণে বাংলা টপ্পার প্রচলন করলেন রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। পাঞ্জাবী টপ্পার লড়ন্ত প্রকৃতি বাংলাভাষার স্বভাব সৌন্দর্যের সঙ্গে বেমানান এইকথা উপলব্ধি কওে নিজ প্রতিভাগুণে বাংলা টপ্পা সৃষ্টি করলেন যা বাংলাগানের ধারাবাহিকতার ইতিহাসে নতুন এক যুগ প্রবর্তন করলো।

সময় এগিয়ে চলে। পরাধীন দেশ, দেশবাসীর হৃদয়ে একটাই আর্তি, মুক্তি চাই। কত আন্দোলন, কত রক্তপাত, অসহনীয় অত্যাচাওে জর্জরিত ভারতবাসী। বাংলা গানের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। কবি, গীতিকার, সুরকার, অনন্য প্রতিভার অধিকারী। রবিবাবুর স্পর্শে নতুন এক ধারার সংযোজন হল। ওই সময় রুচিশীল শিক্ষিত সমাজে ঠাকুরবাড়ীর মনীষীদের গানও স্মরণীয়। সমসাময়িক কালে আমরা আরও তিনজন দিক্‌পাল সংগীত স্রষ্টাকে পেলাম– দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন। কিছুকাল পরেই যিনি কাব্যসংগীত, ভক্তিসংগীত, রাগাশ্রয়ী সংগীত, গজল, ঠুমরী অঙ্গ, দেশাত্মবোধক ইত্যাদি সকল প্রকার সংগীত ধারা অনুসৃত গানে বাংলাগানকে সমৃদ্ধ করলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এঁদের হাত ধরেই বাংলাগান বাঙালির গান হয়ে উঠল।

'স্বর্ণযুগ' বলতে কোন সময়টিকে বোঝায়, কে এই নামকরণ করেছেন বা কেন বাংলাগানের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্বভাবতই এই প্রশ্নগুলি মনে আসে। 'স্বর্ণযুগ' কথাটি কিন্তু কারো ব্যক্তিগত সৃষ্টি নয়। অসাধারণত্ব বোঝাতে আমরা যেমন সোনার ছেলে, সোনামুখ, সোনার বাংলা, সোনার ফসল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি তেমনইভাবেই 'স্বর্ণযুগ' ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সেই যুগ যেখানে অতি উৎকৃষ্ট মানের গান সৃষ্টি হয়েছে। গান সৃষ্টি কর্মে প্রয়োজন হয় একজন গান রচয়িতা, গানের সুরকার এবং সেই গানটি গাওয়ার একজন গায়ক বা গায়িকা। বাংলাগানের স্বর্ণযুগে আমরা পেয়েছিলাম এমন অতি উত্তমমানের বহুসংখ্যক গীতিকার, সুরকার এবং সংগীত শিল্পী। মোটামুটিভাবে বিগত শতাব্দীর ছয়ে দশক থেকে আট এর দশক এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাগানের 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষ থেকে আটের দশক পর্যন্ত যে সংখ্যক সুরকার, গীতিকার ও সংগীত শিল্পী সমাবেশ ঘটে তা পূর্বে আর ঘটেনি। গীতিকার হিসাবে পাই– প্রণব রায়, মুকুল দত্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, প্রমুখ গুণীজনকে। সুরকার হিসাবে পাই– রবীন চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সেন, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, মোহিনী চৌধুরী, সলিল চৌধুরী, অনিল বাগচী, অনল চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি কালজয়ী সুরকারকে। শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোর কুমার, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, উৎপলা সেন, নির্মলা মিশ্র, সবিতা চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন ইত্যাদি আরো কত যে গুণী শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তা এককথায় প্রকাশ করা যাবে না। এঁদের মধ্যে সুরকার হিসাবেও স্বীয় প্রতিভা প্রকাশ করেছিলেন– হেমন্ত, মান্না, সতীনাথ, শ্যামল, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ গুণীজন। স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল পঙ্কজকুমার মল্লিক, হিমাংশু দত্ত, রাঁইচাদ বড়ালদের হাত ধরে এবং আমার মতে শেষ হয় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর হাত ধরে।

১৯৮০-র দশক থেকে বাংলাগানের আরেকটি শাখা পল্লবিত হয়। তাকে শ্রোতা ও সমালোচকেরা 'জীবনমুখী বাংলাগান' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই গান মূলত গদ্যাত্মক, বর্ণনাধর্মী অর্থাৎ বাস্তবজীবনের বিভিন্ন ঘাত, প্রতিঘাত, সমস্যা প্রভৃতি বর্ণিত হয় এই গানে। ইউরোপীয় লঘু সুর ও ছন্দাশ্রিত এর বেশির ভাগ গান। জীবনমুখী গানের গায়ক গায়িকারাই গানের বাণী ও সুর সৃষ্টি করে থাকেন। এই কারণে এই জাতীয় গানের কোন গুরু-শিষ্য পরম্পরা সৃষ্টি হয় নি। শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন) জীবনমুখী গানের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তারূপে স্বীকৃত।

একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাগানের একটি সাম্প্রতিক রূপ দেখা যায়। যাকে 'বাংলা ব্যান্ডের গান' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। একে ইউরোপীয় লঘু প্রকৃতির দলবদ্ধ কণ্ঠ সংগীতের বাংলা সংস্করণ বলা যায়। এই জাতীয় গানের সুর হয় বাংলা লোকগীত আশ্রিত, নয়তো পাশ্চাত্য সুর অনুকৃত অথবা কোন গোত্রহীন নাম না জানা সুর অবলম্বিত। আমাদেও দেশে প্রাচীনকালে যে 'বৃন্দগান' প্রচলিত ছিল 'বাংলা ব্যান্ডের' গান কিন্তু সেই জাতীয় নয়। এই গানে সাহিত্যগুণ নেই বললেই চলে, বাদ্যযন্ত্রেও প্রাবল্য ও চটুল ছন্দেও প্রয়োগে গানগুলি গাওয়া হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে কালে কালে বাংলাগানের বিভিন্নধারায় এতো গুণীজনের অভ্যুদয় অথবা সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও সেই সময়গুলিকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হলো না? আরো প্রশ্ন জাগে বর্তমানে কি তাহলে সত্যিকারের প্রতিভাবান গায়ক, সুরকার বা গীতিকারের অভাব ঘটল? আমার নিজস্ব ধারণা অনুসারে একটু আলোচনা করা যাক্। স্বর্ণযুগের পূর্ববর্তী কালের সম্পের্কে বলতে গেলে বলতে হয় সেই সময় যাঁদের পেয়েছি তাঁরা হলেন বাংলাগানের স্তম্ভ স্বরূপ। যে যে শৈলীর বাংলাগান পেয়েছি যেমন টপ্পাঙ্গ, ঠুংরী অঙ্গ, লোকসুরভিত্তিক, বিদেশীসুরাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ, রাগরাগিণীর সুরযুক্ত, এই সকল প্রকার গানই কিন্তু স্বর্ণযুগের গানেও প্রভাব ফেলেছে। স্বর্ণযুগে পূর্ববর্তী কালের সকল উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একঝাঁক অতি উত্তম মানের গীতিকার সুরকার ও শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভা। যে সকল গান রচিত হয়েছে, সুরারোপিত হয়েছে এবং গায়ক বা গায়িকা গেয়েছেন, তাঁরা এক একটি গানের জন্য ব্যয় করেছেন বহু সময়, তার সঙ্গে চলেছে কঠিন অনুশীলন। একই কথা বলতে হয় রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রেও। সারাদিন রিহার্সাল করে হয়ত রেকর্ড করা গেছে একটি মাত্র গান। ফলে সমস্ত শিল্পী, সহযোগী বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ও সুরকারের মিলিত প্রয়াস, আন্তরিকতা ও দক্ষতায় সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী বাংলাগান। কি পুজোর গানে কি চলচ্চিত্রের গানে, জন্ম নিয়েছে এক অনুপম সৃষ্টি।

আমরা স্বর্ণযুগোত্তর কালে বিশেষ করে বর্তমানে যে সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, চলেছি না বলে বোধ হয় ছুটছি বললে ঠিক বলা হবে। আমরা এখন যে সব অনুষ্ঠান দেখি, বিস্মিত হতে হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গান গাওয়ার ক্ষমতা দেখে, সেখানে আমাদের প্রতিভার অভাব ঘটেছে বললে একেবারেই ভুল বলা হবে। এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি যে সবকিছুই চট্‌জলদি করতে হবে। একসঙ্গে

আটখানা গান চাই একটা সিডি করতে হলে। গীতিকার সুরকারকে কোন সময়ই দেওয়া যাবে না ভাববার। একদিনে আটটি গানের track তৈরী করতে হবে। স্টুডিয়োতে বসে সঙ্গে সঙ্গে সেই রেকর্ডিং হবে, একবারই রিহার্সাল ব্যাস take শব্দ গুনতে হবে। এমনটি অনেক সময় যখন গানের track তৈরী হবে তখন আসল শিল্পী থাকবেনই না, পরে উনি ডাবিং করবেন। জানলেনই না কে বা কারা বাজালো। ফলে কোন আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হলোই না। শিল্পীও সেইদিনই গান তুলে গেয়েছিলেন। তৈরী হয়ে গেলো সিডি।

সিনেমার গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সবই ছন্দপ্রধান, একই ধরনের বাজনা, একই ধরনের সুর। পরপর শুনলে মনে হয় একটি গানই শুনছি। স্বভাবতই কারো মনে থাকে না। ছন্দ ও বাজনা প্রধান হওয়ায় কিছুদিন খুব হিট হয় তারপরই হারিয়ে যায়। পুজো প্যান্ডেলে এক বছর সেই হিট গানটি বাজে আর তার সাথে বাজে স্বর্ণযুগের গান অথবা রবীন্দ্রসংগীত। পরের বছর শেষোক্ত দুই ধরনের গান বাজে আর সেই বছরের হিট বাংলাগানটি বা গানগুলি বাজে, আগের বছরের গান নয়। এই স্রোতের মধ্যেও দুটি একটি গান তৈরী হয় গীতিকার সুরকারের নিজস্ব মননে, অপূর্ব সুরের ছোঁয়ায় বা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে। সেগুলিও মানুষের মন ছুঁয়ে যায়, নস্টালজিক হয়ে পড়ে মন, শুনলে সারাদিন চলে সুরের অনুরণন।

পরিশেষে বলি, একঝাঁক না হলেও যে কিছু উচ্চমানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী আছেন তাঁদের যদি আরো সময় দেওয়া যেত চিন্তা করার তাহলে নিশ্চয়ই কিছু অনুপম সৃষ্টি হতো। বাংলাগান নিয়ে নিত্য যে পরীক্ষা-রিরীক্ষা চলছে হয়তো সেইখান থেকেই নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করে আবার সৃষ্টি হবে স্বর্ণদিনের মতো বাংলাগানের ডালি। আমরা সেই উপহার পাবার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. গোস্বামী প্রভাতকুমার, *ভারতীয় সংগীতের কথা*, প্রকাশক: শ্রীমতী হিরন্ময়ী ও বসুধা গোস্বামী, কোলকাতা, ১৯৯২।
২. *বাংলা সংগীত* (বিশেষ সংখ্যা), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, ২০০৫।
৩. *বাঙালীর গান*, সম্পাদনা: দুর্গাদাস লাহিড়ী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমী, কোলকাতা, ২০০১।
৪. গোস্বামী করুণাময়, *বাংলাগানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩।